ইকুইটিবিডি অবস্থানপত্র, জুন ৭, ২০১৬

কর বৃদ্ধি নয়, বরং অর্থ পাচার বন্ধ হোক সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ পরিবেশ তৈরিতে গনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করার বিকল্প নেই

১. বাজেট ২০১৬-১৭: কর বাড়ালেও ভর্তুকি কেন কমবে

সরকার গত ২জুন ২০১৬ তারিখে নতুন ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য ৩,৪০,৬০৫ কোটি টাকার নতুন বাজেট ঘোষণা করেছে যেখানে রাজস্ব আয় হিসেবে ২,৪৮,২৬৮ কোটি টাকা এবং বাজেট ঘাটতি ৯২,৩৩৭ কোটি টাকা দেখানো হয়েছে যা জিডিপি'র ৫%। এই রাজস্ব আদায় এবং ঘাটতি মোকাবেলা করা এখন বড় চ্যালেঞ্জ। এই ঘাটতি মোকাবেলা করার জন্য বৈদেশিক ঋণ হতে ৩০,৭৮৯ কোটি টাকা, আভ্যন্তরিন উৎস হতে ৬১,৫৪৮ কোটি টাকা, ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে ৩৮,৯৩৮ কোটি টাকা এবং সঞ্চয়পত্র বিক্রি করে ১৯,৯৩৮ কোটি টাকা সংগ্রহের পরিকল্পনা করা হয়। এতে করে সুদ পরিশোধের পরিমান আনেক বেড়ে যাবে। **নতুন বাজেটে সুদ পরিশোধ বাবদ প্রায় ৩১,৯৫১ কোটি টাকা ব্যায় ধরা হয়েছে যা মোট বাজেটের প্রায় ১২% এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় ২৬% বেশি। অর্থমন্ত্রী নতুন বাজেটে যে রাজস্বনীতি ঘোষণা করেছেন, তাতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) পরামর্শ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে যেমন ভ্যাট হার বাড়ানো, ভর্তুকি কমানো, আমদানি শুল্ক কমানো ইত্যাদি**। এই বাজেটে গত বছরের তুলনায় ভর্তুকির পরিমান ৩ হাজার কোটি টাকা (১৩%) কমেছে। এই ভর্তুকি কমানো হলে কৃষি সহ অন্যান্য শিল্পের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাবে এর প্রভাব হিসেবে সকল ভোগ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। **এতে করে দেশে বিদেশী পণ্যের আধিপত্য বেড়ে যাবে এবং দেশীয় শিল্পের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে**। অন্যদিকে করের হার ও এর পরিধি বৃদ্ধি করা হচ্ছে, ফলে সকল মানুষ বিশেষ করে দরিদ্র ভোক্তা শ্রেনীকে কর দিতে হবে। অতএব একদিকে জনগণের কাঁধে যেমন করের বোঝা চাপানো হচ্ছে তেমনি ভর্তুকি কমিয়ে দিয়ে জীবনযাত্রা ব্যয় আরও বেশী বাড়ানো হচ্ছে। সরকার এভাবে ভর্তুকি না কমিয়ে অন্যান্য অনুন্নয়ন ব্যয় কমিয়ে তা সমন্বয় করতে পারত।

২. রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে অপ্রদর্শিত অর্থনীতি এবং অর্থ পাচার বড় বাধা

ক. **বাংলাদেশে রাজস্ব আদায় ব্যবস্থাপনার অন্যতম দুর্বল ভিত্তি হচ্ছে দুর্বল কর আদায় ব্যবস্থাপনা এবং অপ্রদর্শিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ** যার একটি বড় অংশ দখল করে আছে বহুজাতিক কোম্পানী কর্তৃক কর গোপন করার মাধ্যমে। বহুজাতিক কোম্পনীগুলো এসকল অর্থ বিভিন্ন পন্থায় Transfer Pricing বা Profit Shifting এর মাধ্যমে তাদের প্রধান কার্যালয় বা তাদের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান গুলোতে বা করস্বর্গ নামে পরিচিত, সেসকল দেশে স্থানান্তর করা হয়। এই ধরনের কার্যাবলী থেকে সরকার আভ্যন্তরীন সম্পদ সংগ্রহ বিশেষ করে কাংখিত রাজস্ব আদায় করতে পারে না, যে কারণে প্রতি বছর বাজেট ঘাটতি ও ঋণের মাধ্যমে উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহ করতে হয়।

খ. **Global Financial Integrity (GFI) এর ২০১৫ এর রিপোর্ট** অনুযায়ী ২০০৪-২০১৩ এই দশ বছরে বিল কারচুপি, ঘুষ, দুর্নীতি, আয়কর গোপন ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পাচার হয়েছে ৫,৫৮৭.৭০ কোটি ডলার। প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলার এদেশ থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে। শুধুমাত্র ২০১৩ সালে এর পরিমান ছিল সর্বচ্চো যা ৭৭,৬০০ কোটি টাকা (৯.৭ বিলিয়ন ডলার), যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বৈদেশিক অনুদানের ১২গুনেরও বেশি এবং বৈদেশিক ঋণের ১৪১% বেশি। পাচারের এই আশংকাজনক উর্ধ্বগতির কারনে দেশে পরিকল্পিত ও কাংখিত বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের সংকট দেখা দিচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। পাশাপশি সরকারও তার নিজস্ব উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় সম্পদ ঘাটতী মোকাবেলা করতে হচ্ছে। **লক্ষনীয় যে, এই ঘাটতী মোকাবেলার জন্য সরকার ব্যাংক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীলতা এবং ভ্যাট এর মত পরোক্ষ করের বোঝা দরিদ্র জনগনের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন**। অর্থ পাচার রোধে

GFI Report-2015 (IFF from BD), Tk Billion

Year	Illicit Financial Flow	Trade Misinvoicing	Illicit Hot Money outflow
2004	261.07	261.07	0.00
2005	332.44	272.53	59.90
2006	263.48	213.25	50.15
2007	319.64	260.68	58.97
2008	502.55	477.83	24.73
2009	477.91	423.54	54.37
2010	421.90	390.62	31.36
2011	461.84	370.50	91.34
2012	563.55	510.59	52.96
2013	753.95	651.69	102.26
Total	**4358.33**	**3832.30**	**526.03**
Average	**435.83**	**383.23**	**52.60**

সরকার যদিও এক্ষেত্রে কিছু নীতিমালা করছে কিন্ত এর সুষ্ঠু ও কার্যকর বাস্তবায়নের অভাবে দেশ থেকে অর্থ পাচার রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। *[আমাদের বুধবার: ১৬/১২/২০১৫]*

গ. **সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (এসএনবি) কর্তৃক প্রকাশিত 'ব্যাংকস ইন সুইজারল্যান্ড ২০১৪' শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন** অনুযায়ী ২০১৪ সাল শেষে সুইস ব্যাংকগুলোয় বাংলাদেশিদের অন্তত ৫০.৬০ কোটি সুইস ফ্রাঁ (৪,৫৫৪ কোটি টাকা) গচ্ছিত রয়েছে এবং **এই গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ এক বছরের ব্যবধানে ৪২.৭২% (১,৩১৮ কোটি টাকা) বেড়েছে**। বিশ্লেষকদের মতে, কয়েক বছর ধরে মোট জিডিপি'র তুলনায় বিনিয়োগের যে হার রয়েছে, তার চেয়ে সঞ্চয়ের হার বেশি। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের বিশেষ ফেলো ড:দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য্যের প্রশ্ন, "অর্থ পাচার করে কারা? শক্তিশালী লোকেরা। দেখার বিষয়, সরকার তাঁদের মুখোশ উন্মোচন করতে চায় কি না।*[প্রথম আলো: ২০/০৬/২০১৫]*

বিভিন্ন সময়ে সুইস ব্যাংকগুলোয় বাংলাদেশীদের গচ্ছিত টাকা

সাল	গচ্ছিত সুইস ফ্রাঁ হিসেবে	গচ্ছিত টাকা হিসেবে
২০১৪	৫০.৬০ কোটি	৪,৫৫৪ কোটি
২০১৩	৩৭.১৯ কোটি	৩,২৩৭ কোটি
২০১২	২২.৮৯ কোটি	১,৯০৮ কোটি
২০১১	১৫.২৩ কোটি	১,২৯৫ কোটি
২০১০	২৩.৬০ কোটি	১, ১৬৮ কোটি
২০০৯	১৪.৯০ কোটি	১,২৪১ কোটি
২০০৮	১০.৭০ কোটি	৮১২ কোটি

সুত্র: সুইস ন্যাশনাল ব্যাংক (এসএনবি) কর্তৃক প্রকাশিত 'ব্যাংকস ইন সুইজারল্যান্ড ২০১৪' শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন

ঘ) **মালয়েশিয়ায় ২০০২ সালে "মাই সেকেন্ড হোম প্রোগ্রাম"** (এমএমটুএইচ) চালুর পর থেকে জুন ২০১৩ জুন পর্যন্ত ২৩৭০ জন বাংলাদেশী "সেকেন্ড হোম" সুবিধা নিয়েছে এবং গত এক দশকে "সেকেন্ড হোম" পেকেজ বাবদ ৬,০০০ কোটি টাকা এবং সরাসরি প্লট বা ফ্ল্যাট কেনা বাবদ ৪,০০০ কোটি টাকা পাচার হয়েছে। এসব অর্থ পণ্যের আমদানি-রফতানি, রেমিটেন্স ও হুন্ডির মাধ্যমে সে দেশে পাচার হয়েছে। *[আমাদের বুধবার: ২৮/১০/২০১৪]*

অর্থপাচার এবং বিদেশে নাগরিকত্বের সুবিধা দিতে ঢাকায় গোপন সেমিনার: গত ২৯ এপ্রিল, ২০১৬ইং মালয়েশিয়ায় অর্থপাচার এবং বিদেশে নাগরিকত্বের সুবিধা দিতে ঢাকায় একই দিনে দুইটি গোপন সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে বিনিয়োগের বিভিন্ন প্রস্তাব তুলে ধরে মালয়েশীয় প্রতিষ্ঠান এসিই হোল্ডিংস। সেমিনারটিতে হুন্ডি বা অন্য কোন উপায়ে কিভাবে মালয়েশিয়ায় অর্থ পাচার তথা বিনিয়োগ করা যায় সে সম্পর্কে ধারনা দেয়া হয়। বিদ্যমান আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ হতে মূলধনি খাতে বিদেশে টাকা নেয়ার কোন সুযোগ নেই। **প্রশ্ন হলো, এই ধরনের সেমিনার করার সাহস বা সুযোগ তারা কি করে পায়**? *[বনিক বার্তা ০৪/০৫/২০১৬]*

ঙ) অপ্রদর্শিত অর্থের রাজনৈতিক অর্থনীতি:
বাংলাদেশে রাজস্ব আদায় ব্যবস্থাপনার অন্যতম দুর্বল ভিত্তি হচ্ছে অপ্রদর্শিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বা Underground Economy। **বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ পরিচালিত পৃথক গবেষণায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির পরিমাণ মোট জিডিপি'র ৪৮% হতে ৮৪% পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে**। মাননীয় অর্থমন্ত্রী ২০১০-১১ বাজেট পরবর্তী এক প্রেস ব্রিফিং-এ বলেন, বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে অপ্রদর্শিত অর্থনীতির পরিমান জিডিপি'র সর্বোচ্চ ৮৪% এবং সর্বনিম্ন ৪৮%। এর গড় হার বিবেচনা করলে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ছায়া অর্থনীতির পরিমাণ ছিল ৯,৯৯০ বিলিয়ন টাকা।

অপ্রদর্শিত অর্থের উৎস:

অবৈধ বা অনৈতিক কর্মকান্ড	বৈধ কিন্তু জাতীয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত নয়
ঘুষ, দুর্নীতি, চোরাচালান, অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসা, সম্পত্তি দখল, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের লোকসান, বেসরকারীকরণ, শিল্প স্থাপনের জন্য নেওয়া ঋণের অর্থ লুট, নগদ সহায়তা ও কর অবকাশ সুবিধার নামে বিভিন্ন সরকারী সুযোগ সুবিধা থেকে অর্থ আত্মসাৎ, আন্তর্জাতিক টেন্ডার চুক্তি, সরকারী ক্রয়, বৈদেশিক মুদ্রার অবৈধ লেনদেন, মুদ্রা পাচার ও হুন্ডি, মাস্তানি/ চাঁদাবাজী/ সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, সিনেমা তৈরি ও হাউজিং ব্যবসা, চোরাকারবার, সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে আইনের অপব্যবহার, কালোবাজারী, ভেজাল পণ্য উৎপাদন ও বিক্রি ইত্যাদি।	বিনিয়োগে অস্বাভাবিক মুনাফা, পেশাজীবীদের অতিরিক্ত ফি, পুঁজির অতিরিক্ত আয়, অতিরিক্ত ব্যক্তি আয় ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নতুন এই জাতীয় বাজেট বক্তিতায় অপ্রদর্শিত অর্থনীতি বন্ধে কোন সুনির্দিস্ট দিক নের্দেশনা পাওয়া যায়নি। বরং গত বছরের মত এবারও কলো টাকা সাদা করার সুযোগ রেখেছেন। এক্ষেত্রে যদি অপ্রদর্শিত অর্থকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে একদিকে যেমন জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, তেমনি প্রত্যক্ষ কর আদায়ের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আদায়ের হার কাংখিত পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। **পাশাপাশি এর প্রভাবে ঘাটতি বাজেটের আশংকা যেমন হ্রাস পাবে তেমনি দেশী-বিদেশী ঋণ গ্রহনের ঝুঁকিও কমবে।**

চ) অফশোর ব্যাংকিংয়ের আড়ালে ৩৪০ কোটি টাকা পাচার:
বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে মতে, বেসরকারি খাতের এবি ব্যাংকের অফশোর ইউনিটের মাধ্যমে চার বিদেশি কোম্পানির নামে ৪ কোটি ২৫ লাখ ৪০ হাজার ডলার (৩৪০ কোটি টাকা) পাচার করেছে। যে উদ্দেশ্যে এসব ঋণ নেওয়া হয়েছিল তা ব্যবহার না করে এই ঋণের অর্থ অন্য হিসাবে সিঙ্গাপুর ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে পাচার হয়েছে। ব্যাংক খাতে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটে এটাই বড় ঘটনা। **অফশোর ব্যাংকিং হলো ব্যাংকের অভ্যন্তরে পৃথক ব্যাংকিং ব্যবস্থা। বিদেশি কোম্পানিকে ঋণ প্রদান ও বিদেশি উৎস থেকে আমানত সংগ্রহের সুযোগ রয়েছে অফশোর ব্যাংকিংয়ে। স্থানীয় মুদ্রার পরিবর্তে বৈদেশিক মুদ্রায় হিসাব হয় অফশোর ব্যাংকিংয়ে। ব্যাংকের কোনো নিয়ম-নীতিমালা অফশোর ব্যাংকিংয়ে প্রয়োগ হয় না। কেবল মুনাফা ও লোকসানের হিসাব যোগ হয় ব্যাংকের মুল হিসাবে।** 'পানামা পেপারস' নামে অর্থ পাচারের যে ঘটনা ফাঁস করা হয়েছে, তা মূলত অফশোর ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমেই ঘটেছে। *[প্রথম আলো: ২৬/০৪/২০১৬]*

৩. জনগণের টাকার রাজনৈতিক লুটপাটে ভর্তুকি কেন?

রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলো বাঁচাতে সরকার আরও ২,০০০ কোটি টাকা মূলধন হিসাবে দিচ্ছে। হল-মার্ক গ্রুপ, বিসমিল্লাহ গ্রুপ ও বেসিক ব্যাংক থেকে নিয়ে গেছে প্রায় ১০,০০০ কোটি টাকা। এই অর্থ জনগণের সম্পদ। রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পরিচালকদের নিয়োগ দেয় সরকার। পাশাপাশি ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পর্ষদে রাজনৈতিক বিবেচনায় পরিচালক নিয়োগ দিয়ে আসছে সরকার। হল-মার্কের জালিয়াতির জন্য পরিচালনা পর্ষদও দায় এড়াতে পারে না বলে অর্থ মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় তা পুরেপুরি আমলে নেয়নি। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বেসিক ব্যাংক থেকে ৪,৫০০ কোটি টাকা বেরিয়ে যাওয়ার পেছনে ব্যাংকটির পর্ষদের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। একের পর এক জালিয়াতি ও কেলেংকারির কারণে চরম মূলধন ঘাটতিতে রয়েছে ব্যাংকগুলো। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর দায়িত্বহীনভাবে ঋণদানের প্রবণতা ও খেলাপি ঋণগ্রহীতাদের পার পেয়ে যাওয়ার বড় কারণ হলো বাংলাদেশের ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক এলিটদের পারস্পরিক আঁতাত। **অথচ সরকার আত্মস্যাৎ করা এই অর্থ আদায়ের পদক্ষেপ না নিয়ে জনগণের কাধে করের চাপ বাড়িয়ে দিয়ে এসকল দুর্নীতিগ্রস্থ ব্যাংকে পুনরায় মূলধন যোগানের ব্যবস্থা করছে**। *[আমাদের বুধবার: ২৫/০৩/২০১৫, ১৯/০৮/২০১৫, বনিক বার্তা ১২/০৪/২০১৬]*

৪. সম্প্রসারিত হচ্ছে ভ্যাটের হার ও আওতা

আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভ্যাটের হার ও এর আওতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্পূরক শুল্ক কমানোর ফলে আসছে অর্থবছরে সরকারের যে রাজস্ব ক্ষতি হবে তা পুষিয়ে নিতে ভ্যাট আদায়ের পরিধি ও পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। বর্তমানে ২২টি খাত সংকুচিত মূল্য ভিত্তিতে বিশেষভাবে ভ্যাট ছাড়ের সুবিধা পাচ্ছে। এর মধ্যে ৮টি খাতে বিশেষ কর সুবিধা তুলে নিয়ে বিদ্যমানের চেয়ে বর্ধিত হারে ভ্যাট আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। অন্যদিকে "প্যাকেজ ভ্যাট" বর্তমানের তুলনায় শতভাগ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। এই প্যাকেজ ভ্যাট সাধারনত ছোট ব্যবসায়ীরা দিয়ে থাকে এবং বিভিন্ন সিটি করপোরেশন ও জেলা হিসেবে এর হার বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। নতুন বাজেটে প্যাকেজ ভ্যাট ১৪,০০০ টাকাকে ২৮,০০০ টাকা, ১০,০০০ টাকাকে ২০,০০০ টাকা, ৭,০০০ টাকাকে ১৮,০০০ টাকা এবং ৩,৬০০ টাকাকে ৭,০০০ টাকা করার প্রস্তাব করা হয়। এতে করে জিনিস পত্রের দাম বাড়বে, যার বিরূপ প্রভাব পড়বে ভোক্তা তথা সাধারণ মানুষের ওপর।

প্রত্যক্ষ কর আদায় বিশেষ করে Multi National Company (MNC) ও ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে কর আদায় তুলনামূলক ভাবে কঠিন হওয়ায় অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণের সহজ হাতিয়ার হিসেবে প্রত্যক্ষ কর না বাড়িয়ে পরোক্ষকর তথা ভ্যাটের হার এবং এর আওতা বাড়ানো হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের ওপর বোঝা বাড়বে এবং ধনী ও গরীবের মধ্যে আয় বৈষম্য আরো বৃদ্ধি পাবে। পরোক্ষ কর সবসময় গরীব ও সাধারন মানুয়ের জন্য নিবর্তন মূলক। বর্তমানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের হার প্রায় ৩০% ও ৭০%। উল্লেখ্য যে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)-এর প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী সরকার 'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২' প্রনয়ণ করেছে যা মূলত ব্যবসায়ীদের বাধার মুখে এই নতুন বছরে বাস্তবায়ন না

হলেও আগামী ২০১৭-১৮ অর্থবছর তা বাস্তবায়ন হবে। কিন্তু পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে তা এখনই বাস্তবায়ন করা হবে।

৫. থমকে আছে বেসরকারি বিনিয়োগ

বেসরকারি বিনিয়োগ বছরের পর বছর একই জায়গায় আটকে আছে। অবকাঠামোর উন্নয়ন, রাজনৈতিক অস্থিরতা, এবং জমির স্বল্পতার কারনে বিনিয়োগ বাড়ছেনা। গত ২০৪-১৫ বছরে এর হার ছিল জিডিপি'র ২২.০৭% এবং ২০৫-১৬ বছরে ২১.৭৮%। এই স্থবিরতার কারনে কাঙ্খিত কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছেনা। BBS হিসেবে গত ২বছরে মাত্র ৬লাখ নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে, অথচ প্রতিবছর ২১লাখ নতুন করে শ্রমবাজারে প্রবেশ করে। তাই

বিবরনী	২০১৬সাল	২০১৫সাল
ব্যবসা শুরু	১১৯	১১১
নির্মান কাজের অনুমোদন	১১৮	১১৮
বিদ্যুৎ প্রাপ্তি	১৮৯	১৮৯
সম্পত্তি নিবন্ধন	১৮৫	১৮৪
ঋণ প্রাপ্তি	১৩৩	১২৮

বিনিয়োগ না বাড়লে যেমন কর্মসংস্থান হবেনা তেমনি হবেনা কাঙ্খিত রাজস্ব আদায়। সরকার নতুন বাজেটে ৭.২% প্রবৃদ্ধির যে কথা বলছে, তার জন্য বেসরকারি খাত হতে ৩০%-৩৫% বিনিয়োগের প্রয়োজন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো, বাংলাদেশ এথেকে বহুদুরে অস্থান করছে। **বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য সুষ্ঠু ব্যবসায়িক পরেবেশ সৃষ্টি, এর পরিচালনা ব্যয় কমিয়ে আনা এবং সর্বপরি সংঘাতপূর্ণ রাজনীতি পরিহার করে ব্যবসায়ীদের ভেতরে পূর্ণ নিরাপত্তা ও আইনের শাসন নিশ্চিত না করা গেলে এই বেসরকারি বিনিয়োগ হবেনা**। এর জন্য প্রয়োজন মুক্ত স্বধীন নিরপেক্ষ নির্বাচনী ব্যবস্থাসহ যাবতীয় গনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শক্তিশালী বিকাশ। *[প্রথম আলো: ০৩/০৬/২০১৬]*

৬. বহুজাতিক কোম্পানী প্রকৃত কর দেয়না

ব্রিটিশ আমেরিকা টোবাকো, মোবাইল ফোন অপারেটরদের মতো বহুজাতিক কোম্পানীগুলো বিভিন্ন পন্থায় কর ফাঁকি দিয়ে থাকে। বিটিআরসি'র রিপোর্টে বলা হয় দেশের শীর্ষ চার সেলফোন অপারেটর সিম রিপ্লেসমেন্টের নামে নতুন সিম বিক্রি করে প্রায় ৩,১০০ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি দিয়েছে। অন্যদিকে অর্থ মন্ত্রণালয় বলছে, "ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানি লিঃ" তাদের দু'টি ব্র্যান্ডের সিগারেটে মূল্যস্তরে মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে ১,৯২৪ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি দেয়। সরকার এদেরকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করলে বিপুল পরিমাণ প্রত্যক্ষ কর আদায় হতো, ফলে ভ্যাটের মত পরোক্ষ করের উপর সরকারকে এতটা নির্ভরশীল হতে হতো না। *[বণিকবার্তা, ৮ও৯ জানুয়ারী,২০১৪]*

৭. অপচুক্তিতে বছরে ৭০০কোটি রাজস্ব ক্ষতি

অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ কর্তৃক এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে বিনিয়োগের সুযোগ নিয়ে বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানিগুলো ২০১৩ সালে ৮ কোটি ৫৩ লাখ ডলার বা ৭০০ কোটি টাকা কর কম দিয়েছে। ১৮টি দ্বিপক্ষীয় 'অপচুক্তি'র মাধ্যমে বিশ্বের ১৫টি দেশের প্রতিষ্ঠান এ দেশ থেকে এই টাকা নিয়ে গেছে। ১৫টি দেশের কোম্পানিগুলোর মধ্যে যুক্তরাজ্যের কোম্পানিগুলোই সবচেয়ে বেশি ১কোটি ৪৫ লাখ ডলার কর কম দিয়েছে। আর যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলো ১কোটি ১৫লাখ এবং কোরিয়ার কোম্পানিগুলো ১কোটি ৩ লাখ ডলার কম দিয়েছে। মূলত এসব দেশের সঙ্গে সম্পাদিত দ্বৈতকর অব্যাহতি চুক্তিগুলোতে এমন শর্ত থাকে যেখানে কম কর দিয়ে বিদেশি কোম্পানিগুলো মুনাফা নিয়ে যেতে পারে। বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশেই সর্বোচ্চ ১৮টি অপচুক্তি আছে এবং বেশি কর দেওয়া হচ্ছে। রাজস্ব ক্ষতির এই অর্থ দিয়ে (৭০০ কোটি টাকা) এদেশে প্রতিবছর ৩৪ লাখ মানুষের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা যেত। *[প্রথম আলো: ২৯/০৫/২০১৬]*

৮. বছরে ৩২ হাজার কোটি টাকা নিয়ে যাচ্ছেন বিদেশি কর্মীরা

অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে কমরত বিদেশিরা প্রতি বছর দেশ থেকে প্রায় ৪০০ কোটি ডলার নিয়ে যাচ্ছেন যা টাকার হিসাবে যা প্রায় ৩২ হাজার কোটি টাকা। এ অর্থ বাংলাদেশের মোট রেমিট্যান্স আয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এবং প্রতি বছর এর পরিমাণ বাড়ছে আশঙ্কাজনকভাবে। বর্তমানে 'ওয়ার্ক পারমিট' নিয়ে বৈধভাবে যত বিদেশি কাজ করছেন, তার চেয়ে অবৈধের সংখ্যা কয়েক গুণ বেশি, যার সংখ্যা এক লাখও হতে পারে। অবৈধভাবে অনেক বিদেশি কর্মী বাংলাদেশে কাজ করে কোনো কর পরিশোধ ছাড়া তাদের টাকা অবৈধভাবে নিজ দেশে পাঠাচ্ছেন। মূলত: বাংলাদেশে প্রকৌশল, চিকিৎসা, গার্মেন্ট, মার্চেন্ডাইজিং, শিল্প কারখানা ইত্যাদি খাতে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনে বিদেশি পরামর্শকসহ দক্ষ কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন লোক কাজ করছেন। বিনিয়োগ বোর্ড এর তথ্য মতে বিদেশিদের জন্য সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত ওয়ার্ক পারমিট দেওয়া হয়। ভ্রমণ এবং ব্যবসার ভিসা নিয়ে স্বল্প সময়ের জন্য অনেকে এদেশে এসে তাদের বড় একটি অংশ কাজ শেষে ফিরছেন না। মূলত তারাই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অবৈধভাবে কাজ করেন এবং তাদের আয়ও করের আওতায় আসছে না।*[সমকাল: ২৭/০৩/২০১৬]*

৯. কালো টাকা পাচার রোধে ভারত কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ:

ক) অপ্রদর্শিত অর্থনীতির উপর শ্বেতপত্র প্রকাশ:

২০১২ সালের মে মাসে ভারত সরকার অপ্রদর্শিত অর্থনীতির উপর শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। ভারত আন্ত:দেশ ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য ৮৮টি দেশের সাথে DTAAs (Double Taxation Avoidance Agreement) চুক্তি সম্পাদন করেছে এবং তথ্যের আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ২২টি দেশের সাথে TIEAs (Tax Information Exchange Agreement) চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ নিয়েছে ও এর আওতায় ইতিমধ্যে দেশটি ৮টি দেশের সাথে TIEAs চুক্তি সম্পাদন করেছে। এর ফলে ভারত বিগত ১০বছরে পাচারকৃত অর্থের মধ্যে প্রায় ১১৭ হাজার কোটি রুপি রাজস্ব আদায় করে।

বছর	রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ (রুপি)
২০০২-০৩	১,৩৫৬ কোটি
২০০৩-০৪	১,২৯০ কোটি
২০০৪-০৫	৪,৪১৮ কোটি
২০০৫-০৬	৮,০৪৯ কোটি
২০০৬-০৭	৯,১৪৭ কোটি
২০০৭-০৮	১১,৭৯০ কোটি
২০০৮-০৯	১৫,৭৪০ কোটি
২০০৯-১০	১৬,১৯৮ কোটি
২০১০-১১	২১,৫০৯ কোটি
২০১১-১২	২৭,৪৪২ কোটি

Source: White paper on Black money, India 2012

খ. বিদেশে পাচারকৃত কালো টাকা সংক্রান্ত আইনী পদক্ষেপ:

বিদেশে অর্থ পাচার প্রতিরোধে ভারত সরকার একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে যাচ্ছে এবং ইতিমধ্যে সংসদে নতুন একটি আইনের প্রস্তাব বিল আকারে উত্থাপন করা হয়েছে।

বিদেশে অর্থ পাচার প্রতিরোধে প্রস্তাবিত এই আইনটির বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো:

- বৈদেশিক সম্পদের ক্ষেত্রে আয় এবং সম্পদের তথ্য গোপন ও কর ফাঁকি দিলে ১০ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান

- এই ধরনের অপরাধ মীমাংসার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অভিযোগ মীমাংসার জন্য Settlement Commission এর কাছে যেতে পারবেন না।
- আয় বা সম্পদের তথ্য গোপন করলে আয় বা সম্পদের উপর ৩০০% কর আরোপ করা হবে।
- আয়কর রিটার্ন জমা না দিলে বা এতে বৈদেশিক সম্পদ সম্পর্কে ভুল তথ্য দিলে ৭ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান থাকবে।

গ. অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কালো টাকা প্রতিরোধে আইনী পদক্ষেপ:
দেশের ভিতরে কালো টাকার বিস্তার প্রতিরোধে বেনামী লেনদেন নিষিদ্ধ বিল নামের আরও একটি আইনের বিল লোকসভার বর্তমান অধিবেশনেই উত্থাপন করা হবে।

- সরকার ধারণা করছে যে, এই আইন বেনামী সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার মাধ্যমে, বিশেষ করে আবাসন খাতে বেনামী সম্পদের মাধ্যমে কালো টাকা অর্জনের একটি বড় পথ বন্ধ করা সম্ভব হবে। মূল মালিকের পরিবর্তে অন্য আরেকজনের নামে সম্পদ করা বা রাখাকেই বেনামী সম্পদ হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত আইনে এসব সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার কথা বলা হয়েছে।
- ২০০০ ডলারের উপর যেকোনও কেনাকাটার ক্ষেত্রে Personal Identification Number (PIN) থাকা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। আর এ ধরনের কেনাকাটার ক্ষেত্রে নগত লেনদেনও নিষিদ্ধ করা হচ্ছে।
- আইন বাস্তবায়ন জোরালো করতে, Centre Board of Taxes এবং Central Board of Excise and Custom কারিগরি দক্ষতা বাড়াবে এবং পরস্পরের তথ্যভাণ্ডার ব্যবহার করবে।

১০. আমাদের প্রস্তাবনা

- বাংলাদেশী নাগরিকদের বা কোন দ্বৈত নাগরিকত্ব সম্পন্ন বাংলাদেশীদের বিদেশে সম্পদ ও ব্যাংক একাউন্ট থাকলে তাকে ফি-বছর বিবরণী বাংলাদেশে দিতে হবে। তথ্য গোপন ও কর ফাঁকি দিলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।
- মালয়েশিয়া সহ বিভিন্ন দেশে যেসব বাংলাদেশী নাগরিক নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে, তাদের সকল অর্থনৈতিক তথ্য পরীক্ষা করে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে।
- সুইজারল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশের সাথে ব্যাংক লেনদেনের স্বচ্ছতার উপর আন্ত-দেশীয় চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।
- আইনগত শাস্তির বিধান রেখে হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাচার বন্ধ করতে হবে। কোন সরকারি বা বেসরকারি চাকরিজীবী হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠালে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে হবে।
- বেনামী সম্পদ কেনা বন্ধ করার জন্য ভারতের পথ অনুসরণ করে আইন প্রণয়ন করতে হবে। যেমন,
  - ২০০০ ডলারের উপর যেকোনও কেনাকাটার PIN ব্যবহার এবং এ ক্ষেত্রে নগদ লেনদেনও নিষিদ্ধ করা
  - ধরা পড়লে বেনামী সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা
- হলমার্ক, বিসমিল্লা গ্রুপ, বিভিন্ন রাষ্ট্রায়াত্ত্ব ও বেসরকারি ব্যাংক সহ শেয়ার বাজার কেলেংকারীর আত্মসাতকৃত টাকার উপর তদন্ত কমিশন ও শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে।
- বহুজাতিক কোম্পানি গুলো বিভিন্ন পন্থায় প্রকৃত আয় গোপন করে বিদেশে অর্থ স্থানান্তর করে থাকে। বিশেষ করে মিস ইনভয়েসিং এর মাধ্যমে অর্থ পাচার করে থাকে। এই কোম্পানি গুলো দেশে কত টাকা বিনিয়োগ বা আয় করলো তা অডিট করে এর রিপোর্ট জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে। পাশাপাশি এনবিআর-কে প্রদেয় তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে হবে।
- সবার উপর দেশের সকল রাজনৈতিক শক্তিকে একটি ন্যূনতম সমঝোতা করতে হবে, যাতে দেশের পুজি ও কষ্ট অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা (যা মূলত আয় হয় বিদেশে বাংলাদেশী শ্রমিক এবং দেশে গরীব গার্মেন্টস শ্রমিক হতে) পাচারে কঠিন ব্যবস্থা নেয়া হয়। আর্থিক খাত তথা ব্যাংকিং সেক্টরে বিশেষ করে পাবলিক ব্যাংকিং সেক্টরে জনগনের প্রতি দায়বদ্ধতা তৈরি করতে হবে। সবার উপরে আমরা বিশ্বাস করি যে, সংঘাতপূর্ণ রাজনীতি (পরস্পরকে নি:শেষ করে দেবার রাজনীতি) পরিহার করে সবার ভেতরে বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের ভেতরে পূর্ণ নিরাপত্তা, মর্যাদাপূর্ণ আচরন ও আইনের শাসনের প্রতি পূর্ণ আস্থা নিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ দেশের অর্থ যেন বিদেশে স্থানান্তর না হয় সে জন্য দেশের ভেতরে বিনিয়োগবান্ধব ও শান্ত রাজনৈতিক ও নিরাপত্তার পরিবেশ স্থাপন করতে হবে। যাতে করে দেশের ভেতর নিজের বৈধ অর্থ রাখতে ও বিনিয়োগ করতে সকলে স্বাচ্ছন্দ ও নিরাপদ বোধ করে। এটা না হলে টাকা পাচার হতেই থাকবে এবং তার সাথে হতে থাকবে ব্রেন ডেন অর্থাৎ দেশের জ্ঞানী মেধাপূর্ন লোকজন শান্তি, মর্যাদা ও নিরাপত্তার আশায় দেশ ত্যাগ করবে।
- সংঘাতপূর্ণ রাজনীতির অপরিহার্য অংশ গনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গুলোকে, বিশেষ করে গনমাধ্যম, নির্বাচন কমিশন, স্থানীয় সরকার, দুর্নীতি দমন কমিশন, স্বধীন ও শক্তিশালীভাবে কাজ করার সুযোগ দিয়ে আইনের শাসন কায়েম কতে হবে।
- সরকার বিগত কয়েক বছর পূর্বেই একটি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র প্রনয়ন করেছে। এই কৌশলপত্রের মূল লক্ষ্য হলো প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের সকল স্তরকে দূর্নীতি মুক্ত করা। আমরা মনে করি তা বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন এবং এর আলোকে সরকারের সকল বিভাগ, মন্ত্রনালয় ও প্রতিষ্ঠান সমূহে সংশ্লিষ্ঠ শুদ্ধাচার কৌশল প্রয়োগ ও বাস্থবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
- বিদেশীদের চাপে ভর্তুকি না কমিয়ে সরকারী বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় খরচ কমিয়ে ঘাটতি সমন্বয় করতে হবে।